যাকাত ও সাওম বিষয়ক দু’টি পুস্তিকা

رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام

<বাঙালি - Bengal - بنغالي>

শাইখ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ ইবন বায রহ.

অনুবাদক: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام

الشيخ :عبد العزيز عبدالله بن باز رحمه الله

ترجمة: ذاكرالله أبوالخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ভূমিকা

অনুবাদকের ভূমিকা

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ যাকাত ও সাওম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা দু'টি শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায রহ. কর্তৃক রচিত। শাইখ এ দু'টি পুস্তিকায় যাকাত ও সাওমের মৌলিক বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছেন। এ দু'টি পুস্তিকা বিষয়বস্তু জানা থাকলে সাওম ও যাকাত বিষয়ক অনেক অজানা ও অস্পষ্ট বিষয়গুলোর সমাধান পাওয়া যাবে।

পুস্তিকা দুটির বিষয় বস্তুগুলো বাংলা ভাষাভাষি ভাইদের জানা থাকা খুবই জরুরি। এ কারণে বাংলা ভাষা-ভাষি ভাইদের জন্য পুস্তিকা দু'টি অনুবাদ তুলে ধরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সহজ ও সাবলীল ভাষায় বইটি অনুবাদ করে বিষয় বস্তুগুলোকে ফুটে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আশা করি পুস্তিকাদ্বয় পড়ে সাওম ও যাকাতের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করা মুসলিম ভাইদের জন্য সহজ হবে।

অনুবাদক

জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

প্রথম আলোচনা যাকাত

যাকাতের গুরুত্ব

এ পুস্তিকাটি লেখার অন্যতম কারণ, যাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলিম ভাইদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও উপদেশ দেওয়া। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম যাকাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ে উদাসীন। অথচ যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি অন্যতম স্তম্ভ এবং ইসলামের মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান, যা ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না; কিন্তু তা স্বত্বেও মুসলিমগণ সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

“পাঁচটি বস্তুর ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযানের সাওম পালন করা”।[1]

গরীব জনগোষ্ঠী যাকাতের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়াতে এবং জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাকাতের উপকার ও গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কারণে মুসলিমগণের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। যাকাত ইসলামের সৌন্দর্যসমূহের একটি অন্যতম সৌন্দর্য। এ ছাড়াও যাকাত ইসলামের সৌন্দর্যের বাহ্যিক রূপ এবং সু-স্পষ্ট নিদর্শন।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬

যাকাতের উপকারিতা

যাকাতের উপকারিতার মধ্যে অন্যতম হলো, যাকাত ধনী ও গরীবের মধ্যে ভালোবাসার সেতু বন্ধনকে সু-দৃঢ় ও মজবুত করে। কারণ, সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো, যে তার প্রতি দয়া করে, তাকেই সে মহব্বত করে, ভালোবাসে। যাকাতের আরেকটি উপকারিতা হলো, যাকাত আত্মাকে পাক-পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে কৃপণতার মতো ঘৃণিত চরিত্র থেকে দূরে থাকা যায়। যেমনটি কুরআনে করীম যাকাতের এ অর্থের দিক ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

“তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো‘আ কর, নিশ্চয় তোমার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

যাকাতের আরেকটি উপকারিতা হলো, অভাবগ্রস্ত ও হত-দরিদ্র জন গোষ্ঠীর প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি করতে একজন মুসলিমকে অভ্যস্ত ও যোগ্য করে গড়ে তোলে।

যাকাতের আরেকটি উপকারিতা হলো, যাকাত দেওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি ও প্রতিদান অর্জন হওয়া। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩﴾ [سبا: ٣٩]

“আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা”। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯]

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»

"হে আদম সন্তান, তোমরা খরচ কর, আমি তোমাদের ওপর খরচ করব"।[2] এ ছাড়াও যাকাতের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৫২, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৯৯৩

যাকাত আদায় না করার শাস্তি

যারা যাকাত আদায়ে উদাসীনতা দেখায় এবং কৃপণতা করে তাদের বিষয়ে কুরআনে করীমে কঠিন হুমকি এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ۝٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ۝٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

“আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) ‘এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৫, ৩৬]

যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না, তা অবশ্যই তা গচ্ছিত মাল যদ্বারা তার মালিককে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

“সোনা রূপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন এ ধন সম্পদকে আগুনের পাত বানানো হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলো দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পিঠে দাগ দেওয়া

হবে। যখনই ঠাণ্ডা হবে পূণরায় তা উত্তপ্ত করা হবে -এমন দিন যেদিনের পরিমাণ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এভাবে বান্দার পরিণতি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে”।[3]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট, গরু ও ছাগলের মালিকদের বিষয়ে আলোচনা করেন যারা তাদের পশুর যাকাত আদায় করে না। তিনি তাদের জানিয়ে দেন যে, নিশ্চয় তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাকাত না দেওয়ার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ»

“যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এ যাকাত আদায় করে নি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হবে, সাপটি তার মুখের দুই পার্শ্ব কামড় দিয়ে বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ”।[4]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বাণী তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ ١٨٠﴾ [ال عمران: ١٨٠]

“আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং

---

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৩

তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০]

যে ধরনের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়

চার ধরনের মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়:

এক- যমীন থেকে উৎপাদিত ফসল।

দুই- চতুষ্পদ জন্তু।

তিন- স্বর্ণ- রৌপ্য।

চার- ব্যবসায়িক মালামাল বা পণ্য।

উল্লিখিত চার শ্রেণির সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্ধারিত একটি পরিমাণ রয়েছে, তার কম হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। ফল ও উৎপাদিত ফসলের যাকাতের নিসাব, পাঁচ ওসক। আর এক ওসকের পরিমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা‘ দ্বারা ষাট সা‘। ফলে খেজুর কিসমিস, গম, ভুট্টা ও চাউল ইত্যাদির মধ্যে যাকাতের নিসাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা‘ দ্বারা তিনশত সা‘। এক সা‘-এর পরিমাণ হলো, একজন মাধ্যম আকৃতির লোকের দুই হাত ভর্তি চার কোষ। তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো, এক-দশমাংশ যদি এ ফসল উৎপাদনে পানি সেচ দেওয়ার জন্য তার কোনো কষ্ট করতে হয় নি। যেমন, বৃষ্টির পানি, নদী, বন্যা বা নালার পানি দ্বারা ফসল চাষ করেছে। আর যদি টাকা খরচা করে, সেচে পানি, ডিপ মেশিন নলকূপ ইত্যাদি পানি দিয়ে থাকে তখন তার মধ্যে এক-দশমাংশের অর্ধেক যাকাত দিতে হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত।

উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির চতুষ্পদ জন্তুর নিসাবের বিস্তারিত আলোচনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। যাদের সক্ষমতা রয়েছে এমন আগ্রহীদের জন্য জরুরি হলো, তারা যেন জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে যাকাতের জরুরি বিধানগুলো জেনে নেয়। যদি এ রিসালাটি সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা না থাকত, তাহলে মানুষের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা বিস্তারিত আলোচনা করতাম।

আর রূপার নিসাব হলো, একশ চল্লিশ মিসকাল। এর পরিমাণ সৌদি আরবের মুদ্রা অনুযায়ী পঁয়ষট্টি রিয়াল।

আর স্বর্ণের নিসাব বিশ মিসকাল। বিশ মিসকাল সমান বিরানব্বই গ্রাম।

আর যারা এ পরিমাণ স্বর্ণ, চাঁদি অথবা যে কোনো একটির মালিক হবে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তাদেরকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। লভ্যাংশ সাধারণত মূল সম্পদেরই অংশ, তাই তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার কোনো দরকার নেই। যেমনিভাবে জন্তুর ক্ষেত্রে মূল সম্পদের ওপর বছর অতিবাহিত হলে এবং মূল জন্তু নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য তার থেকে উৎপন্ন বাচ্চাদের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

স্বর্ণ, চাঁদি ও নগদ অর্থ যা বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন নামে যেমন, ডলার, রিয়াল, টাকা ও রুপি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে, যখন তা স্বর্ণ বা চাঁদির মূল্য সমপরিমাণ হয় এবং তার ওপর বছর অতিবাহিত হয়, তখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

মহিলাদের ব্যবহারিক অলংকারের যাকাত

টাকার সাথে সংযোগ করা হবে, মহিলাদের ব্যবহারিক স্বর্ণ ও রূপা, যদিও তা ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে। আলেমদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মহিলাদের ব্যবহারিক স্বর্ণ বা চাঁদি যদি নিসাব পরিমাণ পৌঁছে থাকে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তাতে যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর ব্যাপকতাই এর প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ»

"সোনা রূপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন এ ধন সম্পদকে তার শাস্তির জন্য আগুনের পাত বানানো হবে"।[5]

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত, একজন মহিলার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি দেখে তিনি বললেন,

«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» ، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» ، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

"তুমি কি এর যাকাত আদায় কর? সে বলল, না, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আগুনের দু'টি চুড়ি তোমাকে পরিয়ে দেওয়া হোক? এরপর তিনি চুড়ি দু'টি খুলে ফেললেন এবং রাসূলের দরবারে ফেলে দিয়ে বললেন, এ দু'টি চুড়ি আল্লাহ জন্য এবং তার রাসূলের জন্য।[6]

---

[5] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭

[6] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৩; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৭৯

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, স্বর্ণের কিছু অলংকার তিনি ব্যবহার করতেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো কি গচ্ছিত সম্পদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» "যে সম্পদ যাকাতের নিসাব পরিমাণ পৌঁছার পর তার যাকাত আদায় করা হয়, তা গচ্ছিত সম্পদ নয়"।[7] একই অর্থে আরও একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

[7] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৪। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ব্যবসায়িক মালের যাকাত

আর যে সব মালামাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করা হয়, তা বছর শেষে মূল্য নির্ধারণ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে বের করতে হবে। চাই তার মূল্য স্বর্ণ ও চাঁদির সমপরিমাণ হোক বা না হোক অথবা অধিক হোক। এর প্রমাণ সামুরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ»

"অতঃপর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখা হত, তা থেকে যাকাত বের করার আদেশ দিতেন"।[৪]

ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা যমীন, গাড়ি, বাড়ি, পানির মেশিন ইত্যাদি ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। বছর শেষে মূল্য হিসাব করে এ সব সম্পদের যাকাত অবশ্যই দিতে হবে। যে সব ঘর-বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ভাড়ার টাকার ওপর একবছর পূর্ণ হলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে; কিন্তু মূল বাড়ি-ঘরের ওপর যাকাত দিতে হবে না। কারণ, তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়নি।

অনুরূপভাবে ভাড়ার গাড়ি ও ব্যবহারিক গাড়ি যদি তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা না হয়, বরং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাতে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি গাড়ি ভাড়ার টাকা নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে যাকাত দিতে হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি যমীন ক্রয়, বিবাহ, ঋণ পরিশোধ ও খরচা করা ইত্যাদি যে কোনো উদ্দেশ্যে টাকা সঞ্চয় করার পর তা যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় এবং

[৪] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬২

তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। কারণ, শরী'আতের দলীলসমূহ এ ধরনের সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া বিষয়ে ব্যাপক।

অনুরূপভাবে ইয়াতীম ও পাগলের মাল যদি নিসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, বছর শেষে জমহুর আলেমদের মতে অভিভাবকদের ওপর তাদের পক্ষ থেকে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। যাকাত বিষয়ক দলীলসমূহের ব্যাপকতা এর প্রমাণ। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইয়ামেনের দিকে প্রেরণ করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন,

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ،

"তুমি তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে"।[9]

---

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং১৩৯৫; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৯

যারা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত

যাকাত আল্লাহর হক, সুতরাং যে যাকাত খাওয়া উপযুক্ত নয়। যাকাতের মাল দিয়ে তাকে সহানুভূতি দেখানোর কোনো অবকাশ নেই এবং যাকাতের মাল নিজের কোনো উপকারে বা ক্ষতি থেকে বাঁচা, সম্পদ রক্ষা এবং দুর্নাম গোছানোর জন্য ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। বরং একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো, যাকাতের মাল তার প্রকৃত পাওনাদারকে নিঃস্বার্থভাবে খুশি মনে আল্লাহকে রাজি খুশি করা উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেওয়া, যাতে সে দায় মুক্ত হয় এবং অধিক সাওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে যাকাতের বিভিন্ন শ্রেণির পাওনাদারদের বিষয়টি সু-স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

"নিশ্চয় সাদাকাহ হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

আল্লাহর দু'টি মহান নাম দ্বারা আয়াতটি শেষ করা দ্বারা স্বীয় বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় বান্দাদের অবস্থা এবং তাদের মধ্যে যারা সাদাকাহ খাওয়ার উপযুক্ত আর যারা উপযুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন এবং তিনি তার শরী'আত ও পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে প্রজ্ঞাবান। ফলে তিনি সবকিছুই যথাযথ উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করেন। যদিও অধিকাংশ মানুষের নিকট তার হিকমতের

অনেক রহস্যই অজ্ঞাত; যাতে বান্দাগণ তার শরী‘আতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার হুকুমের প্রতি অনুগত থাকে।

আল্লাহর প্রতি আমাদের কামনা, যেন তিনি আমাদের ও মুসলিমদের তার দীন বুঝার তাওফীক দেন, তার সাথে মু‘আমালায় সততা দান করেন এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দেন। আর আল্লাহর কাছে আমাদের আরও কামনা যে, তিনি যেন আমাদের তার ক্ষোভের কারণসমূহ থেকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও বান্দাদের অতি নিকটে। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর ও তার পরিবারবর্গ এবং সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

শাইখ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.

সাওম বিষয়ক পুস্তিকা

আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ ইবন বায রহ.-এর পক্ষ থেকে ঐ সব মুসলিম ভাইদের প্রতি যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের পথে পরিচালনা করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। আর আমার এবং তোমাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত ও বারাকাত নাযিল হোক।

অতঃপর, রমযান মাসে সাওম পালন করা, রাতে সালাতে দাঁড়ানোর মাধ্যমে কিয়ামুল লাইল করা এবং এ মাসে নেক আমলের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক অগ্রসর হওয়ার ফযীলত বিষয়ে এটি একটি সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। এ ছাড়াও এ রিসালাটিতে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত।

রমযানের ফযীলত

যখন রমযান মাস আসতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে রমযান মাসের সু-সংবাদ দিতেন এবং জানিয়ে দিতেন যে, এটি এমন একটি মাস যাতে রহমত ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিতাড়িত শয়তানকে শিকলবদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

“রমযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও খারাপ জিন্নদের শিকল পরানো হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে এ মাসে জাহান্নামের দরজা খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, তার কোনো দরজা

বন্ধ করা হয় না। একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী! কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও। আর হে অনিষ্টতার পথিক! অনিষ্টতা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান এবং তা প্রতি রাতেই”।[10]

« أتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خير يغشيكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا، ويستجاب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأدوا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل».

“তোমাদের সামনে রমযান মাস উপস্থিত হয়েছে, বরকতের মাস। তাতে রয়েছে কল্যাণ যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের ঢেকে ফেলবেন। ফলে রহমত নাযিল হবে, আর তাতে গুনাহ দূরীভূত হবে, দো‘আ কবুল হবে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করবেন এবং তিনি তার ফিরিশতাদের মাঝে তোমাদের নিয়ে গর্ব করেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজেদের থেকে আল্লাহর জন্য ভালো ও নেক আমলসমূহ তুলে ধরো। কারণ, হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে এ মাসে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়”।[11]

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমযান মাসের সাওম পালন করবে তার অতীত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় কদরের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে, তার অতীতের গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে”।[12]

---

[10] তিরমিযি, হাদীস নং ৬৮২

[11] কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৩৬৯১

[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০

«مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ جُنَّةٌ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

“আদম সন্তানের যে কোনো নেক আমল যা সে পালন করে থাকে তার বিনিময় হিসেবে তার জন্য দশ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তবে সাওম, তা কেবল আমার জন্যই পালন করা হয়, ফলে আমি নিজেই তার বিনিময় দিয়ে থাকি। কারণ, সাওম পালনকারী খানা-পিনা ও পানাহার কেবল আমার কারণেই ছেড়ে দেয়। সাওম মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। আর সাওম পালনকারীদের জন্য রয়েছে দু’টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় আর অপরটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। একজন সাওম পালনকারীর মুখের না খাওয়াজনিত গন্ধ আল্লাহ তা‘আলার নিকট মিশকের সুগন্ধির থেকেও অধিক প্রিয়”।[13]

রমযানের সাওম পালন করা ও কিয়াম করার ফযীলত বিষয়ক হাদীস অসংখ্য। সুতরাং একজন মুমিনের জন্য উচিত হবে এ সুযোগটি যথাযথভাবে কাজে লাগানো। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের ওপর রমযান মাস পাওয়ার সুযোগ দিয়ে যে দয়া করেছেন তা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হওয়া ও মন্দ আমল থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে কাজে লাগানো। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর যা ফরয করেছেন তা আদায় করতে সচেষ্ট হওয়া এবং বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া। কারণ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো ইসলামের আসল খুঁটি এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর

[13] নাসাঈ, হাদীস নং ২২১৫

সবচেয়ে বড় ফরয। প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর দায়িত্ব হলো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং অত্যন্ত মনোযোগ ও ধীরস্থীরভাবে সময়মত আদায় করা। পুরুষদের ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো, সালাতসমূহকে আল্লাহ যে সব ঘরকে সমুন্নত রাখতে আদেশ করেছেন সে ঘরসমূহে জামা'আতের সাথে আদায় করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ [البقرة: ٤٣]

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون : ١، ٢]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত"। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১, ২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون : ٩، ١١]

"আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে তারাই হবে ওয়ারিস, যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে"। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৯, ১১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

“আমাদের মধ্যে আর তাদের (অমুসলিমদের) মধ্যে চুক্তি হলো সালাত। সুতরাং যে সালাত ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল”।[14]

সালাতের পর গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো, যাকাত আদায় করা। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥﴾ [البينة: ٥]

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হলো সঠিক দীন। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۝٥٦﴾ [النور: ٥٦]

“আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৬]

[14] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২১; নাসাঈ হাদীস নং ৪৬৩

রমযানের সাওমের গুরুত্ব

আল্লাহর মহান কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত প্রমাণ করে যে, যে তার সম্পদের যাকাত দেয় না তাকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। সালাত ও যাকাতের পর গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো, সাওম পালন করা। সাওম ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

“পাঁচটি বস্তুর ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযানের সাওম পালন করা”।[15]

[15] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬

সাওমের উদ্দেশ্য

একজন মুসলিমের ওপর ফরয হলো, সাওম পালন করা ও কিয়ামুল লাইল করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যেসব কথা ও কর্ম হারাম করেছেন তা থেকে রক্ষার অনুশীলন করা। কারণ, সাওম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা, আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা। আর স্বীয় মাওলার আনুগত্য করার মাধ্যমে প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে চলার জন্য মানবাত্মার সাথে সার্বক্ষণিক সংগ্রাম করা। আল্লাহ তা'আলা যে সব বিষয়সমূহ নিষেধ করেছেন তার ওপর ধৈর্যের অনুশীলন করা। সাওমের উদ্দেশ্য শুধু খাওয়া, পান করা ও যাবতীয় সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকাই নয়। এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করেছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়, যাতে তিনি বলেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ »

"সাওম ঢালস্বরূপ, ফলে সাওম পালনকারী যেন অশ্লীল ও অপকর্ম না করে, যদি কোনো লোক গায়ে পড়ে বিবাদ করে বা গালি দেয় সে যেন বলে আমি সাওম পালনকারী, দু' বার"।[16]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে আরও একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যাতে তিনি বলেন,

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তদনুযায়ী আমল করা ছাড়ল না, তার খানা ও পান করা ছেড়ে দেওয়াতে কোনো লাভ নেই"।[17]

[16] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪

[17] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৩

উল্লিখিত হাদীস এবং এ ছাড়াও আরও অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, একজন সাওম পালনকারীর ওপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ তা'আলা যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা। এ ধরনের সাওম দ্বারা এ আশা করা যায় যে, একজন সাওম পালনকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। আর সাওম পালনকারী তার সিয়াম ও কিয়াম কবুল হওয়ার আশা করতে পারেন।

রমযান বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

রমযান সম্পর্কে এমন কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা কিছু মানুষের নিকট আজও অস্পষ্ট। আমি সেগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

এক- একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো, ঈমান ও সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করা। কাউকে দেখানো বা শোনানোর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করবে না। আর নিজ এলাকা, পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের অনুকরণে সাওম পালন করবে না, বরং সাওম এ কারণে পালন করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সাওম পালন করা ফরয করেছেন এবং সাওম পালন করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে মহা বিনিময় ও সাওয়াব দেবেন। অনুরূপভাবে কিয়ামুল-লাইল একজন মুসলিম ঈমান ও সাওয়াবের আশায় করবে, পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে করবে না। সিয়াম ও কিয়ামুল-লাইলের এ মহান উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমযান মাসের সাওম পালন করবে, তার অতীত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"।[18]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় কদরের রাতের কিয়াম করবে, তার অতীতের গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"।[19]

---

[18] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮

[19] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭

যে সব কারণগুলো সাওম নষ্ট করে না

দুই- সাওম সম্পর্কিয় আরও যে সব বিষয়ের বিধান কতক মানুষের নিকট অস্পষ্ট তা হলো, একজন সাওম পালনকারী আঘাত পেয়ে জখম হলো, তার নাক দিয়ে রক্ত বের হলো, বমি করল, অনিচ্ছাকৃতভাবে তার পেটে পানি চলে গেল ইত্যাদি। এগুলো কোনো কিছুই তার সাওমকে ভঙ্গ করবে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করে, তাহলে তার সাওম ভেঙ্গে যাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»

“সাওম পালন অবস্থায় যার অনিচ্ছায় বমি হয়, তার সাওম ভাঙবে না, আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করে তাকে সাওমের কাযা করতে হবে”।[20]

তিন- অনুরূপভাবে যদি কোনো সাওম পালনকারীর গোসল ফরয হওয়ার পর ফরয গোসল করতে সূর্য উদয় পর্যন্ত দেরি করে তবে তারা সাওম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ যদি কোনো ঋতুবতী বা প্রসূতি নারী ফযরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে পবিত্র হওয়া সত্বেও সে গোসল না করে এবং সূর্য উদয়ের পর গোসল করে, তাকে অবশ্যই সাওম পালন করতে হবে। গোসল করতে সূর্য উদয় পর্যন্ত দেরি করা সাওম রাখার জন্য কোনো বাধা নয়; কিন্তু তার জন্য এ ধরনের দেরি করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। তারপর ওপর ফরয হলো, সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করে পবিত্র হয়ে ফজরের সালাত আদায় করা। অনুরূপভাবে নাপাক ব্যক্তির জন্য গোসল দেরিতে করা উচিৎ নয়। তার ওপরও ফরয হলো, সূর্য উদয়ের পূর্বে গোসল করা এবং ফজরের সালাত সময় মতো আদায় করা। এ বিষয়ে অলসতা করা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয় বরং উচিৎ হলো, গোসল করতে

[20] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৮০

তাড়াহুড়া করা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পবিত্র হয়ে যাওয়া, যাতে ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারে।

চার- অনুরূপভাবে আরও যে সব কারণগুলো সাওম নষ্ট করে না তা হলো, রক্তদান করা, ইনজেকশন দেওয়া যদি তা খাদ্য জাতীয় না হয়। তবে ইনজেকশনকে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেওয়া উত্তম, যদি দেরি করা সম্ভব হয় এবং তাতে কোনো অসুবিধা দেখা না দেয়। অন্যথায় দিনের বেলা দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ»

"তুমি সংশয়যুক্ত বিষয় ছেড়ে এমন বিষয় গ্রহণ করো যাতে সন্দেহ ও সংশয় নেই । কারণ, সত্য প্রশান্তি আর মিথ্যা সংশয়"।[21]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন,

فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِه

"যে ব্যক্তি সংশয়যুক্ত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দীন ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণ করল"।[22]

সালাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন

পাঁচ- আরও যে সব বিধান কতক মানুষের নিকট অস্পষ্ট তা হলো, সালাতে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন না করা। চাই নফল সালাত হোক অথবা ফরয সালাত। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সালাতে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন সালাতের রুকনসমূহের একটি

[21] তিরমিযি, হাদীস নং ২৫১৮

[22] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২

গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ধীর-স্থিরতা অবলম্বন ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। আর ধীরস্থিরতা হলো, সালাতে বিনয়ী হওয়া ও তাড়াহুড়া না করে মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করা, যাতে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সালাত আদায়কারীর স্বীয় অবস্থানে ফিরে আসে। অধিকাংশ মানুষকে দেখা যায় রমযানে তারাবীহর সালাত আদায় করে অথচ সালাতে কী আদায় করে তা সে নিজেও বুঝে না এবং সালাতে বিনয় ও ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করে না; বরং তারা সালাতকে কাকের ঠোকর দেওয়ার মত আদায় করে মাত্র। এ ধরনের সালাত বিশুদ্ধ হয় না এবং সালাত আদায়কারী গুনাহগার হয় এবং কোনো সাওয়াবের অধিকারী হয় না।

তারাবীহর সালাতের রাকাত সংখ্যার সমাধান

ছয়- আরও যে সব বিধান কতক মানুষের নিকট অস্পষ্ট তা হলো, কতক মানুষ মনে করে তারাবীহর সালাত বিশ রাকাতের কম পড়া যাবে না, আবার কতক মনে করে এগার বা তের রাকাতের বেশি পড়া যাবে না। এগুলো সবই অমূলক এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী ধারণা।

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাতের সালাতে বেশি বা কম করার অবকাশ ইসলামে রয়েছে। রাতের সালাতের এমন কোন সংখ্যা নির্ধারিত করা নেই যার বিরোধিতা করা যাবে না; বরং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাত রমযান ও রমযানের বাহিরে কখনো এগারো রাকাত কখনো তের রাকাত আবার কখনো তার চেয়ে কম বা বেশি আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

«مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى»

"দুই রাকাত দুই রাকাত। আর যখন সকাল হওয়ার আশঙ্কা কর, এক রাকাত পড়ে নাও। তাহলে তুমি যা পড়লে তাকে বিজোড় বানিয়ে দিলে"।[23]

রমযান ও রমযানের বাহিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ করেন নি। আর এ কারণেই সাহাবীগণ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কখনো তেইশ রাকাত আবার কখনো এগারো রাকাত আদায় করেছেন। সুতরাং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের যুগে তেইশ রাকাত এগারো রাকাত উভয়টিই সাহাবীগণের আমল থেকে প্রমাণিত।

পূর্বসূরিদের কেউ কেউ রাতের সালাত ছত্রিশ রাকাত এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। আবার কেউ কেউ একচল্লিশ রাকাত পড়তেন বলেও প্রমাণিত। সাহাবীগণের এ আমলগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ও অন্যান্য আহলে ইলমগণ। তিনি বলেন, রাতের সালাতের ক্ষেত্রে রাকাত বিষয়ে কমোবেশ করার অবকাশ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তবে উত্তম হলো, যে ব্যক্তি ক্বিরাত, রুকু ও সাজদাহ দীর্ঘ করবে সে রাকাত সংখ্যা কম করবে আর যে ক্বিরাত, রুকু, সাজদাহ ও রুকু সংক্ষেপ করবে সে রাকাত সংখ্যা বাড়াবে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-এর কথার অর্থ এটিই। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে গভীরভাবে চিন্তা করবে সে অবশ্যই জানতে পারবে, উত্তম হলো, রমযান ও রমযানের বাহিরে এগারো রাকাত বা তের রাকাত সালাত আদায় করা। কারণ, এগারো রাকাত আদায় করা অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের সাথে মিলে। এ ছাড়াও এগারো রাকাত সালাত মুসল্লীদের প্রতি সহানুভূতি এবং সালাতে বিনয় ও ধীর-স্থিরতার অধিক সহায়ক হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি বেশি আদায় করে তাতে কোনো অসুবিধা বা ক্ষতি

[23] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭২

নেই। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যে ব্যক্তি রমযানে কিয়ামু-ললাইল ইমামের সাথে পালন করে, তার জন্য উত্তম হলো, ইমামের অনুকরণ করা এবং তার সাথে সালাত শেষ করা। ইমাম যত রাকাত পড়বে সেও তত রাকাত আদায় করবে। ইমামের আগে সে বাড়ি ফিরে যাবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الرجل مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ»

“যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ করে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কিয়ামুল-লাইল করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য পুরো রাত কিয়ামুল-লাইল করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন”।[24]

[24] তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৮; নাসাঈ হাদীস নং ১৬০৫

রমযান মাসে বেশি বেশি নেক আমল করার গুরুত্ব

প্রতিটি মুসলিমের জন্য উচিৎ হলো, এ মহান মাসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইবাদাত করা। যেমন, বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনসমূহে চিন্তা-ফিকির করা এবং কুরআন বুঝার চেষ্টা করা, তাসবীহ, (সুবহানাল্লাহ) তাহমীদ, (আল-হামদুলিল্লাহ) তাকবীর, (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বেশি বেশি আদায় করা, তাওবা-ইস্তেগফার করা, মানুষকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বারণ করা, গরীব, মিসকীন ও অসহায় মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা, আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখা, প্রতিবেশীকে সম্মান করা, অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে বলেন,

«ينظر الله الى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملا ئكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله»

"আল্লাহ তা'আলা এ মাসে তোমাদের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করেন। তারপর তিনি তার ফিরিশতাদের মধ্যে তোমাদের নিয়ে গর্ব করেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজেদের থেকে আল্লাহর জন্য ভালো ও নেক আমলসমূহ তুলে ধর। কারণ, হতভাগা সেই ব্যক্তি যে এ মাসে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়"।[25]

অন্য হাদীসে আরও বলেন,

---

[25] কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৩৬৯১

«مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ»

“যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো নেক আমল করল, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে একটি ফরয আদায় করল, সে যেন সত্তরটি ফরয আদায় করল”।[26]

«أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» أَوْ «حَجَّةً مَعِي»

“রমযানে উমরা পালন করা হজের সমান” অথবা তিনি বলেন, “আমার সাথে হজ করার সমান”।[27]

এ মহান মাসে বিভিন্ন ধরনের নেক আমলের প্রতি মনোযোগী ও প্রতিযোগী হওয়ার হাদীস ও সাহাবীগণের বর্ণনা অসংখ্য। আল্লাহর নিকট আমাদের কামনা আল্লাহ তা‘আলা যেন, আমাদেরকে এবং সমগ্র মুসলিম জাতিকে এমন সব আমল করার তাওফীক দেন, যাতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্জি। আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাদের সিয়াম ও কিয়ামকে কবুল করেন, আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সংশোধন করে দেন আর আমাদের সকলকে যাবতীয় ফিতনা থেকে হিফাযত করেন। অনুরূপভাবে আমাদের কামনা , তিনি যেন আমাদের নেতৃত্বদানকারীদের সংশোধন করে দেন, হকের ওপর তাদের একত্র করেন। তিনিই এ সবের সত্যিকার অভিভাবক এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল।

সমাপ্ত

[26] বাইহাকী, শু‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৩৩৬

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩